Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 1–9
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

পাগলামির কারুশিল্পে অভিনব উত্তরণ সন্ধানী এক অন্য অবনীন্দ্রনাথ

ড. সোমা দাস (চৌধুরী)
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
টাকি সরকারি মহাবিদ্যালয়
ইমেইল: somachowdhury267@gmail.com

Keyword
শিল্পীসত্তা, আত্ম আবিষ্কার, খামখেয়ালি, গল্প আঁকা, ভারাক্রান্ত হৃদয়, কুটুম কাটাম, যাত্রাপালা

Abstract
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামনে যে পরিচয়ে নিয়ে তিনি উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন তা অবশ্যই- শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি যে একজন মহৎ চিত্রশিল্পী তা বলাই বাহুল্য। তবে এর বাইরেও তাঁর এক অন্যতর পরিচয় তিনি গল্পকার ও পালাকার। এক সময় তাঁর এই পরিচিত রূপকে অতিক্রম করে নিজেকে ভিন্নতর রূপে প্রকাশের যাত্রা শুরু করেছিলেন, খানিকটা অসচেতন খামখেয়ালির ধারায়। হয়তো আত্মপ্রকাশ ও আত্ম-আবিষ্কারের এক অনিশ্চিত আকুতিই ছিল এর নেপথ্যে। সেই সঙ্গে সমসাময়িক বাস্তবতাকে স্বীকার করে মানব চেতনার এক নিরন্তর প্রবহমানতার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার প্রয়াসও ছিল প্রচ্ছন্নভাবে। তথাকথিত শিল্পীসত্তা থেকে চেতনার ও দৃষ্টির এক অভিনব প্রসারণের চূড়ান্ত উদ্ঘাটন ঘটেছিল অবন ঠাকুরের শেষ পর্বের রচনা 'খুদ্দুর যাত্রা'-এ। কলের কাজে নিয়ম প্রকরণ ও কঠোরতা থাকে, বিপরীতে মানুষের আর্টে থাকে অনিয়ন্ত্রিত আনন্দ ও মুক্তির স্বাদ। এই মুক্তির স্বাদের অনুসন্ধানই কি তাঁকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছিল? তাই কখনও শিল্পে কখনও সাহিত্যে কখনও বা চূড়ান্ত অনুসন্ধানের তাগিদে শিল্প-সাহিত্য-বাস্তবের মিশেলে তোলপাড় করেছেন নিজের সত্তাকে। তাঁর সত্তার পরতে পরতে এই আনন্দ পিপাসা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ছিল বলেই হয়তো তিনি কোথাও থিতু হতে পারেন নি। তাঁর রঙ-তুলি ও কালি-কলম চলেছে একই সাথে। ছবির জগতেও অনবরত স্তর পরিবর্তন করেছেন। ছোটদের গল্প লিখতে লিখতে মনে পড়ে গেছে নিজের ছোটবেলা, যা প্রকাশ করছেন 'ঘরোয়া', 'জোড়াসাঁকোর ধারে', 'আপন কথা'-এ স্মৃতিচারণার মধ্যস্থতায়।

একটা নেশা ছিল তাঁর, হীরে খোঁজা। বিভিন্ন পাথর সংগ্রহ করে প্রয়োজনে তাকে ভেঙে দেখতেন হীরা আছে কিনা। সেই থেকে শুরু ঠুকঠাক্। শিল্পী-চোখ সাধারণের মধ্যে রূপের অনুসন্ধান করতে থাকে। হঠাৎ একদিন দেখলেন বাড়ির ছেলেরা নাটক করার চেষ্টা চালাচ্ছে, অনেক আগে লেখা তাঁরই একটা নাটক 'এসপার ওসপার'। ভীষণ উৎসাহে ঢেলে সাজালেন 'নাটুকে ভাব' বাদ দিয়ে করলেন যাত্রা। ঠাকুরবাড়িতে এক অভিনব যাত্রাপালা অভিনীত হল। দারুণ উৎসাহে শুরু হল যাত্রা লেখার পালা। এবার বিষয় নির্বাচন করলেন- 'রামায়ণ'। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে সরাসরি পালা করায় সমস্যা হল 'পয়ারে'। লিখলেন পুঁথি। এবার সেই পুঁথিকে সামনে রেখেই রামায়ণের গল্প নিয়ে লিখলেন 'খুদ্দুর যাত্রা'। এ যাত্রা অভিনব যাত্রা পালা। এখনে পাতায় পাতায় লেখার সঙ্গে সেঁটে দিলেন বিজ্ঞাপন, বিভিন্ন ছবি, সিগারেটের প্যাকেট, দেশলায়ের বাক্স, কাপড়ের টুকরো, চকলেটের মোড়ক আরো কত কি। এর আগে বহু পালা তিনি

'রামায়ণ' কাহিনি অবলম্বনে লিখেছিলেন, কিন্তু এক্ষেত্রে এমনভাবে উপস্থাপিত করলেন কেন? তিনি কি নতুন কিছুর সন্ধানে ছিলেন?

Discussion

> *"নিয়ম ও প্রকরণ এবং তার কঠোরতাই ফোটে নির্মমভাবে কালের কাজে, আর মানুষের আর্টে অনিয়ন্ত্রিত আনন্দ ও মুক্তির স্বাদ এসে লাগে।"* [১]

এই আনন্দ ও মুক্তির অনুসন্ধানই কি তাঁকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছিল? তাই কখনও শিল্পে কখনও সাহিত্যে, কখনও বা চূড়ান্ত অনুসন্ধানের তাগিদে শিল্প-সাহিত্য-বাস্তবকে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করবার বেপরোয়া চেষ্টায় তোলপাড় করেছেন নিজের সত্তাকে। ব্যক্তিজীবনে এমনই অস্থিরতা ছিল তাঁর সর্বদাই। মায়ের বড় ভয় ছিল 'এই ছেলেটার লেখাপড়াও হল না, বিষয়কর্মও শিখল না, কিছুই হল না'। তবুও মায়ের একটা ভরসার জায়গা ছিল- 'রবির সঙ্গে আছিস, বড়ো নিশ্চিন্ত আমি'। এই আস্থা আরেকটু দৃঢ় হল, পায়ের তলার মাটি বেশ একটু শক্ত হল যখন মায়ের এই ছেলের জন্য দিল্লির দরবার থেকে এল রূপোর মেডেল, হলেন আর্ট স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল। বলাই বাহুল্য তিনি 'শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর'।

রঙ-তুলি ও কলি-কলম :

বিদেশী গুরু হ্যাভেল সাহেবের কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই-

> *"অমন করে আমায় যদি না বোঝাতেন ভারত শিল্পের গণাগুণ, তবে কয়লা ছিলেম কয়লাই হয়তো থেকে যেতেম, মনের ময়লা ঘুচত না, চোখ ফুটত না দেশের শিল্প-সৌন্দর্যের দিকে।"* [২]

এই চোখ ফোটা শিল্পীর সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে ব্যক্তিমত ছিল-

> *"পারিজাতের মতো বাতাসে দাঁড়িয়ে আকাশে ফুল ফোটানো আর্টিস্টের কাজ, সুতরাং তার মন্ত্র মানুষের শরীর যন্ত্রের হিসেব খাতার লেখার সঙ্গে এমন কি, বাস্তব জগতের হাড়হদ্দের খবরের সঙ্গে মেলানো মুশকিল।"* [৩]

সত্যিই কি বাস্তবকে মেলানো মুশকিল ছিল? আসলে এ বাস্তব, বাস্তবের নকল। তিনি প্রকৃত বাস্তবকে অস্বীকার করতে চান নি। চেয়েছিলেন সেই বাস্তবকে গ্রহণ করে তাকে আত্মীকরণের মাধ্যমে, কল্পনার মিশেলে নতুন রূপে প্রকাশ করতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে 'সৃষ্টি করা কোনো কিছুর মাপের অপেক্ষা করে না, সে হচ্ছে নিজেকে অর্জন করা, নিজেকে প্রকাশ করা।' এই প্রকাশের কোনো কসরৎ অবন ঠাকুরের মধ্যে ছিল না, এ যেন তাঁর এক সহজাত বৈশিষ্ট্য। তাই দৌহিত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখক হওয়ার পেবল ইচ্ছা ও শখ যখন একটিমাত্র প্লটের অভাবে অনিশ্চয়তার অলি গলিতে ঘোরাফেরা করছে তখনই দাদামশায় (অবন ঠাকুর) উপায় বাতলে দিলেন, বললেন-

> *"এর জন্য ভাবছিস? কেন, স্বপ্ন দেখিস না? স্বপ্নগুলো লিখে ফেল্, দেখবি গল্প আপনি এসে যাবে।"* [৪]

ঠিক এমনই গল্প হতে থাকল অবন ঠাকুরের হাতে। তবে যিনি এই রচনার উৎসধারার মুখ খুলে দিয়েছিলেন তিনি হলেন 'রবিকা'। বলেছিলেন 'যেমন করে তুমি মুখে গল্প কর তেমনি করেই লেখো'। ভরসাও দিয়েছিলেন 'ভয় কী, আমিই তো আছি।' ব্যাস লিখে ফেললেন 'শকুন্তলা'। একটি মাত্র সংস্কৃত শব্দ 'পল্বলের জল' নিয়ে খানিক চিন্তা তারপরই 'না থাক্' বলে শব্দটা রেখে দিলেন। আর কে পায় 'পটাপট করে' লিখে যেতে লাগলেন- ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী, ভূতপত্রীর দেশ, নালক। একদিকে রঙ তুলি অন্যদিকে কালি-কলম। সৃষ্টির যেন অন্ত নেই। খেয়ালী কল্পনার হিসেব মেলা ভার। একের পিঠে এক ছবি এসে যাচ্ছে, আর তৈরী হচ্ছে গল্পকথা।

গল্প আঁকেন অবন ঠাকুর :

- নদীতীরে যে নিবিড় বন ছিল তাতে অনেক জীবজন্তু ছিল। কত হাঁস, কত বক, সারাদিন খালের ধারে বিলের জলে ঘুরে বেড়াত। কত ছোটো ছোটো পাখি, কত টিয়াপাখির ঝাঁক গাছের ডালে ডালে গান গাইত, কোটরে কোটরে

বাসা বাঁধত। দলে দলে হরিণ, ছোটো ছোটো হরিণ শিশু, কুশের বনে, ধানের খেতে, কচি ঘাসের মাঠে খেলা করত। বসন্তে কোকিল গাইত, বর্ষায় ময়ূর নাচত। (শকুন্তলা)

- এমন সময় টাপুর-টুপুর বিষ্টি এল, নদীতে বান এল, অমনি সেই ছেলের পাল, সেই কাঠের দোলা, সেই ছ-পণ কড়ি ফেলে, কোন্ ঘরের কোণে ফিরে গেল। পথের মাঝে তাদের মাছগুলো চিলে কেড়ে নিলে, কোলা ব্যাঙে ছিপগুলো টেনে নিলে, খোকাবাবুরা ক্ষিপ্ত হয়ে ঘরে এলেন, মা তপ্ত দুধ জুড়িয়ে খেতে দিলেন। (ক্ষীরের পুতুল)
- তারপর বলি শোনো- রাবণের কাছ থেকে পুষ্পক রথ তো কেড়ে নিয়ে রামচন্দ্র অযোধ্যায় এসেছেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন রথটি নিয়ে যান আর কি, এমন সময় সুয্যিমামা এসে বলেছেন, 'বাপু রাম ইন্দ্র বজ্জর ফেলে আমার রথটি গুঁড়ো করেচেন, এখন পুষ্পক রথটি উনি নিলে আমি দু-বেলা অপিস করি কেমন করে। উনি রাজার ছেলে ঘরে বসে থাকলে চলে, কিন্তু সকাল সন্ধে আমাকে যে এই সারা পৃথিবী ঘুরে আলো দিয়ে বেড়াতে হয়, আপিস-গাড়ি নইলে আমার চলবে কেন?' (ভূতপত্রীর দেশ)

সহজ সরল ভাষায় ছোটো ছোটো বাক্যখণ্ড সাজিয়ে তিনি ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। 'শকুন্তলা'-তে তপোবন, রাজা দুষ্মন্তের রাজ্য, শকুন্তলার যাত্রাপথ, প্রতিটি ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি বর্ণনায় সংক্ষিপ্ত কাহিনিকে বিস্তৃতি দান করলেও, পড়তে গেলে কোথাও একঘেয়েমি লাগে না। 'ক্ষীরের পুতুল'-এ ছড়া-ছবি-আজগুবি কল্পনা গল্পে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। সেখানেও ছোট ছোট বাক্যখণ্ড, তবে এতে এসে লেগেছে যেন ছন্দবদ্ধ ছড়ার মিষ্টিমধুর আমেজ, মনে পড়ে যায় সেই ছড়া -

- টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে / নদে এল বান,
- খোকা গেল মাছ ধরতে / ক্ষীর নদীর কুলে
  ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে / মাছ নিয়ে গেল চিলে।
- খোকন খোকন ডাকে মায় / খোকন গেল কাদের নায়ে,
  খোকন সোনা ঘরে আয় / তপ্ত দুধ জুড়িয়ে যায়।

'ভূতপত্রীর দেশ'-এর ক্ষেত্রেও পৃথিবীর মাটিতে পা, অথচ কোন কোন যানে কোথায় কোথায় সম্পূর্ণ চেতনা নিয়ে মন উড়ে ঘুরে ভেসে বেড়াচ্ছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। মানুষ-দেবতা-পশু-পাখি-ভূত মিলে মিশে একাকার। যেখানে আজগুবি কল্পনার অন্ত নেই। বাগদাদ, আরব থেকে দিল্লী, অযোধ্যা কিছুই বাদ যায়নি। হারুন-অল-রসিদ, শাজাহান, সুয্যিমামা, হনুমান, ইন্দ্রদ্যুম্ন, রামচন্দ্র, কে নেই? তাঁর কল্পনা বিলাসে সব একসাথে একজায়গায় অদ্ভূত মহিমায় প্রকাশ পেয়েছে। এখানেও ভাষা অতি সহজ সরল। তবে সরল বাক্যের সঙ্গে জটিল যৌগিক বাক্যের উপস্থিতি লক্ষ করা গেল।

"সেদিন আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা। রাত তখন গভীর। রাজপুরে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আলো নিবিয়ে গান থামিয়ে সিদ্ধার্থ ডাকলেন- 'ছন্দক, আমার ঘোড়া নিয়ে এসো'। সিদ্ধার্থের চরণের দাস ছন্দক, কণ্ঠক ঘোড়াকে সোনার সাজ পরিয়ে অর্ধেক রাতে রাজপুরে নিয়ে এল। সিদ্ধার্থ সেই ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন- অনামা নদীর পারে। পিছনে অন্ধকারে ক্রমে মিলিয়ে গেল-কপিলাবস্তুর রাজপুরী, সামনে দেখা গেল- পূর্ণিমার আলোয় আলোময় পথ।" (নালক) 'নালক'-এ বাক্যে কিছুটা ভাষা ও ভাবগত গাম্ভীর্য প্রকাশ পেল। হয়তো গৌতমবুদ্ধের শান্ত-স্নিগ্ধ অবয়ব কাহিনির উপর ছায়াপাত করেছে বলেই এই স্নিগ্ধ-সংযম। আগের গল্প থেকে এ এক অন্য স্বাদের গল্প। তবে কথায় ছবি আঁকার প্রবণতা এখানেও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তাই সূক্ষ্ম বর্ণনায় তৎকালীন 'কপিলাবস্তু' থেকে শুরু করে অঞ্জনা নদী তীরস্থ উরাইল বনের এবং সেইসঙ্গে তৎকালীন সমাজ ও মানুষের যথার্থ ছবি তিনি এঁকে দিলেন। *"...মহারাজের কালো ঘোড়াটি তীরের মতো ছুটে বেরিয়ে ঝড়ের মত কেল্লার দিকে ছুটে আসতে লাগল- পিছনে তার শত-শত ভীল-কারো হাতে বল্লম, কারো হাতে বা তীর ধনুক। মহারাণী দেখলেন, কালো ঘোড়ার মুখ থেকে শাদা ফেনা চারিদিকে মুক্তোর মতো ঝড়ে পড়ছে, তার বুকের মাঝ থেকে রক্তের ধারা রাস্তার ধূলোয় ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে..." (রাজকাহিনী)* 'রাজকাহিনী'-তে ভাষাগাম্ভীর্য ও সরলতার মিশেল ঘটেছে। একদিকে রাজপুত থেকে শুরু করে ভীল সমস্ত মানুষের সামাজিক আচার বিচার ও মনস্তত্ব যেমন স্পষ্ট করেছেন অন্যদিকে তাদের প্রেম-ভালোবাসা, বীরত্ব, স্নেহ, মমতা, প্রতিজ্ঞা, সততা, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, বিশ্বাসঘাতকতার যেন ধারাবাহিক রাজপুত ঘরাণার ছবির সিরিজ।

মন কেন ভার?

দু-তিন বছরের হেরফেরে লিখলেন 'ঘরোয়া', 'জোড়াসাঁকোর ধারে', 'আপন কথা'। এবার তিনি অন্য অবনঠাকুর, সৃষ্টির তাগিদে বাস্তবকে দুচোখ ভরে দেখে, মনের গহনে গ্রহণ ও লালন করে কল্পনার রঙে মিশিয়ে প্রকাশ করতে লাগলেন। এবার তিনি শুধুই আর্টিস্ট নন, যার কাজ কেবল 'পারিজাতের মতোবাতাসে দাঁড়িয়ে আকাশে ফুল ফোটানো'; বরং 'বাস্তব জগতের হাড়হদ্দ'-কে মিশিয়ে নিলেন। তিনি নিজেই স্বীকার করলেন- 'কেবল দূর থেকে জগৎটাকে দেখে চলার অবস্থাটা কখন যে পেরিয়ে গেলাম তা মনে নেই।' এবার স্মৃতির ঘরে জমে থাকা সেই অতি সাধারণ বাস্তব জগৎ ভিড় করল তাঁর লেখায়- পদ্মদাসী, তার দুধ জুড়োবার ছন্দ, দুধের ধারার শব্দ, সাইক্লোনের রাতে ঝড়ের দাপট, পানের বাটা-পিতলের ডাবরের ঝন্‌ঝন্ শব্দ, সেইসঙ্গে সহিস, কোচম্যান, ছিরুমেথর, নন্দফরাস, গোবিন্দ খোঁড়া, ভিস্তি, মুটে, উড়েবেহারা, চৌকিদার, ডাক-পেয়াদা সব্বাই। 'দক্ষিণের বারান্দা'-এ একেবারে শেষের দিকে মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতিচারণা করেছিলেন তাঁর বিদেশ থেকে ফিরে দেখা জোড়াসাঁকোর দাদামশায়ের বাড়ির।

> *"জোড়াসাঁকো-বাড়ির সিঁড়িতে ঝাঁট পড়ে না। বড়ো বড়ো অন্ধকার ঘরের কোণে কোণে জানলা-দরজার ফাঁকে ফাঁকে ধুলো জমেছে। দেয়ালে চুনকাম নেই। জোড়াসাঁকো-বাড়ির চেহারাই বদলে গেছে।"* [৫]

শুধু বদলায়নি সেই আন্তরিক স্পর্শ। তাই তাঁর কামানো চোস্ত গালে দাদামশায়ের দুদিন না কামানো খস্‌খসে গালের ঘষা মনের সোয়াস্তি ফিরিয়েছিল 'পুরানো জোড়াসাঁকোতেই ফিরে এসেছি'। কিন্তু অবন ঠাকুর জানতেন 'জোড়াসাঁকোর মনে ভাঙন ধরেছে'। একদিকে জমিদারি আয়ের অস্থিরতা, আয় হ্রাস ব্যয় বৃদ্ধি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাজার, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে টালমাটাল অবস্থা, তারই পরিপ্রেক্ষিতে সম্পর্কের বাঁধন আলগা হওয়ার তীক্ষ্ণ অনুভূতি, বড়দাদা গগনেন্দ্রনাথের মৃত্যু, মেজদাদার শারীরিক দুর্বলতা, রবিকার চিরবিদায়, জোড়াসাঁকোর বাড়ি বিক্রির তাগিদ প্রবলতর হতে থাকা, লাইব্রেরির তাক থেকে বই চুরি অর্থাৎ 'জোড়াসাঁকোর সরস্বতীর ঘরে সিঁদ' পড়া। ফলে সমস্ত বই বিক্রির সিদ্ধান্ত, কণকেন্দ্রনাথ বাড়ি ছাড়লেন, তারপর একদিন তিনতলা শূনশান করে অন্যত্র চলে গেলেন সমরেন্দ্রনাথ। একসময় ছাদের গায়ের লোহার শিক ভাঙতে গিয়ে ধরা পড়ল সন্তোষ চাকর, যেন 'বাড়ির পাঁজরগুলোকে উপড়ে নিচ্ছে আর বাড়িটা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে'।

তাঁর মন-পাখিটাও ঠিক এমনই যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। এরপরই বরানগরের গুপ্তনিবাসে অবন ঠাকুর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চললেন। বললেন, 'চললুম লোকচক্ষুর আড়ালে বনালয়ে গুপ্ত নিবাস করতে'। গুপ্ত নিবাসে যাওয়ার সময় তিনি বলেছিলেন, 'দ্বারকানাথের ঘড়িটাকে নিয়ে যাস যত্ন করে। ভালো করে সাবধানে বসাস ওটাকে, ওটা জ্যান্ত ঘড়ি'। আসলে শুধু সময় নয়, স্মৃতিকেও তিনি সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন। তাই বাসা থেকে রেলগাড়ি দেখে 'বাড়িমুখো গাড়ি'-র অধীর আকাঙ্ক্ষার এক চাপা বেদনায় উদ্বেল হতে থাকে হৃদয়, যা প্রকাশ পেল 'মাসি'-তে। 'আপন কথা' থেকে 'মাসি', শুধু ভারাক্রান্ত হৃদয়কে খানিকটা মুক্তি দেওয়ার প্রয়াস, স্মৃতিচারণার মধ্যস্থতায়।

রঙ-রেখা, ছবির কথা :

বাড়িতেই পেয়েছিলেন ছবি আঁকার বাতাবরণ- প্রথম দিকে বাবা, জ্যোতি কাকা। পরে দাদা, মেজদা, নিরুদা, সত্যদাদা- প্রত্যেকেই রীতিমত শিখতেন ও আঁকতেন, তবে ছোট্ট 'অবন' শুধু দেখতেন দূর থেকে। তাঁর আয়ত্বে ছিল কেবল ছোটোপিসিমার ঘর। আর 'প্রকৃতি' তাঁর জন্য যে ছবি সাজিয়ে রেখেছে, যা তিনি কোন্নগরের বাগানবাড়িতে যাওয়ার সময় দেখতেন, তা অবাধে আগ্রহভরে আপন সামগ্রী করে মনের গোপন মণিকোঠায় রেখে দিতেন। একদিন তাই এঁকেও ফেললেন 'কোন্নগরের কুঁড়েঘর'। তারপর আর থামেননি কেবল মাঝে মাঝে একটু অবকাশ নিয়েছিলেন। তিনি নিজে স্বীকার করেছিলেন 'আমার প্রথম শিল্প শিক্ষার মাস্টার' সংস্কৃত কলেজের 'অনুকূল' যে শিখিয়েছিল লক্ষ্মী-সরস্বতী আঁকতে। এরপর বেশ কিছু সময় কেটেছে। একসময় আপন খেয়ালে স্বপ্নপ্রয়াণের ছবি আঁকলেন। মেজোমার উৎসাহে কুমুদ চৌধুরীর মধ্যস্থতায় শেখার বন্দোবস্ত হল আর্টস্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল গিলার্ডি সাহেবের কাছেই। তিনি যত্ন করে

শেখালেন প্যাস্টেল ও তেলরঙের কাজ। ছ'মাসেই সব শেখা সমাপ্ত করে বাড়িতেই স্টুডিয়ো 'ফেঁদে' বসলেন। 'রবিকা'-র উৎসাহে আঁকলেন চিত্রাঙ্গদার ছবি।

আর প্যাস্টেল ভালো লাগল না। ইংরেজ আর্টিস্ট সি.এল.পামারের কাছে তৈলচিত্র শিখলেন। কিন্তু গুরু 'অ্যানাটমি স্টাডি' করতে গিয়ে জোর করে মড়ার মাথা আঁকালে অবন ঠাকুর বাড়ি ফিরলেন ১০৬ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে। সব শুনে মা সেবারের মতো আঁকায় দাঁড়ি টানলেন বললেন 'কাজ নেই আর ছবি আঁকায়'। কিছুকাল ছবি আঁকা বন্ধ হল।

এবার জলরঙের পালা। মার কাছে অনুমতি নিয়ে আবার তাঁর কাছেই ভর্তি হলেন। এবার ল্যান্ডস্কেপ আর্টিস্ট, তাই ঘাড়ে ইজেল বগলে রঙের বাক্স নিয়ে ঘোরাঘুরি। মুঙ্গেরের বহু দৃশ্য বন্দী হল ক্যানভাসে। কিন্তু মনের তৃপ্তি মিটছে না কিছুতেই। মনভরার ব্যবস্থা অচিরেই হল- ছোটদাদামশায় নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবির খোঁজ করতে করতে হঠাৎই 'মিসেস মার্টিন ডেল'-এর তাঁকে পাঠানো আইরিশ মেলডির বেশ কিছু বড়ো বড়ো ছবি, যা ছিল অপূর্ব সুন্দর। ইতিমধ্যে ভগ্নীপতি শেষেন্দ্রভূষণের কাছে উপহার পেলেন দিল্লীর এক পার্শিয়ান ছবির বই। রবিকা ও দিলেন কিছু রবি বর্মার আঁকা ছবি। একদিকে পুরাতন ইউরোপীয়ান আর্ট অন্যদিকে পুরাতন ভারতীয় আর্ট- চোখ খুলে গেল তাঁর। আঁকার বিষয় নিয়ে ধন্দ কাটিয়ে দিয়ে রবিকা বললেন 'বৈষ্ণব পদাবলী' পড়ে ছবি আঁকতে। শুরু হল প্রথম দেশী ধরণের ছবি 'শুক্লাভিসার'। কিন্তু হতাশ হলেন মেমসাহেব রাধিকাকে দেখে। 'দেশী টেকনিক' শিখতে ফ্রেমের মিস্ত্রি 'পবন'-কে ধরে শিখলেন ছবিতে সোনা লাগান। তারপর সব টেকনিক শিখে আঁকলেন বৈষ্ণব পদাবলী সিরিজ। তারপর বেতাল পঞ্চবিংশতি। আর থামা নয়। এবার এগিয়ে যাওয়া। আত্মতৃপ্তির কথা বলতে গিয়ে বললেন-

> *"তখন কি আর ছবির জন্য ভাবি, চোখ বুজলেই ছবি আমি দেখতে পাই— তার রূপ, তার রেখা, মায় প্রত্যেক রঙের শেড পর্যন্ত। তখন যে আমার কী অবস্থা বোঝাব কি তোমায়। ছবিতে আমার তখন মনপ্রাণ ভরপুর। হাত লাগাতেই এক একখানা ছবি হয়ে যাচ্ছে।"* [৬]

সেই সময় যাতে বিলিতি আর্টের ছোঁয়া না লাগে তাই বিলিতি ছবির কাগজ পড়া বন্ধ দিলেন 'দিনরাত কেবল এসরাজ বাজাই, ছবি আঁকি'।

ঠিক সেই সময় কলকাতায় প্লেগ দেখা দিল। ভগিনী নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবন ঠাকুর ও দলবল মিলে চাঁদা তুলে প্লেগ হাসপাতাল খুললেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই প্লেগই কেড়ে নিল তাঁর ছোট্ট মেয়েটিকে-

> *"ন-দশ বছরের মেয়েটি আমার টুক করে চলে গেল; বুকটা ভেঙে গেল। কিছুতে আর মন যায় না।"* [৭]

চলে গেলেন চৌরঙ্গির একটা বাড়িতে। সেই সময় মেজোমার (জ্ঞানদানন্দিনী দেবী) কাছে যাওয়া আসার সূত্রে আলাপ হল হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে তিনি বললেন—"You do your work, Your work is your only medicine". তারপরই অবন ঠাকুর হলেন আর্টস্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল। প্রথম দিন চার-পাঁচখানি ছবি সম্বল আর্টগ্যালারি দেখতে গিয়ে অতি সাধারণ ছবি অসাধারণ হয়ে তার কাছে দেখা দিল হ্যাভেল সাহেবের দেওয়া 'আতশী কাচ' দিয়ে। হতবাক্ হয়ে গেলেন ছবিতে অপার 'ঐশ্বর্য' দেখে। কিন্তু আবিষ্কার করলেন এতে 'ভাব'-এর অভাব। এবার তিনি খুঁজে পেলেন তাঁর কাজ-

> *"ঐশ্বর্য পেলুম, কী করে তার ব্যবহার তা জানলুম, এবার ছবিতে ভাব দিতে হবে।"* [৮]

বাড়ি ফিরে আঁকলেন 'শাজাহানের মৃত্যু'। মেয়ের মৃত্যুর যত বেদনা বুকে ছিল সব ঢেলে দিয়ে সেই ছবি আঁকলেন। দিল্লীর দরবার দিল রুপোর মেডেল, 'কংগ্রেস ইন্ডাস্ট্রিয়াল একজিবিশান' থেকে এল সোনার মেডেল, আরো তিন চারটে মেডেল এল এই ছবির জন্য।

এর পরের পর্ব 'মাস্টারি' পর্ব। প্রথম ছাত্র পেলেন সুরেন গাঙ্গুলি। তারপর নন্দলাল। গুরু ও দুই শিষ্যর তখন চলেছে ছবি আঁকার ঝড়। রজনী পণ্ডিত রামায়ণ-মহাভারত শোনান আর তাঁরা ছবি আঁকেন। চারদিকে সাড়া পড়ে গেল, খুলে গেল 'ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি'। তবে আর্টে ব্যর্থতা, দুঃখ, অতৃপ্তি চিরকাল ছিল তার মনে, আবার মাস্টারের দায়িত্ব পালনও করেছেন। তবে শুধু আঁকা নয় ভারত শিল্পের চর্চা করতে গিয়ে তাঁর ও দাদা গগনেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় এখান থেকেই হল ভারতীয় আসবাবের চলন। যাই হোক একদিকে নতুনত্ব অন্য দিকে স্বাতন্ত্র্যের তাগিদে চলেছিল ছবি আঁকার স্তর উন্নয়ন। ইউরোপীয় মিনিয়েচারের ধারায় রাধাকৃষ্ণ সিরিজ দিয়ে শুরু, হ্যাভেল সাহেবের সাহচর্যে রাজপুত

ও মোগল পেইন্টিং ঘরাণায় মননিবেশ, জাপানী শিল্পীদের আগমনে পরিবর্তিত হল শিল্প-শৈলীর, আঁকলেন ওমর খৈয়াম সিরিজ। পুরী থেকে ফিরলেন নতুন ধারা নিয়ে, তবে এ তাঁর একেবারে নিজস্ব ওয়াশ পদ্ধতি। এবার নতুন ঝোঁক চলল প্যাস্টেল পোট্রেট, তারপরেই আরব্য রজনী সিরিজ। ছেলেদের বলেছিলেন- 'এই ধরে দিয়ে গেলুম, আমার জীবনের সব-কিছু অভিজ্ঞতা এতেই পাবে'। তাঁর উপলব্ধিতে শিল্পীর জীবন 'শুধু উজান ভাঁটার খেলা'; তাই এতকালের প্রাপ্তির হিসেব মেলাতে গিয়ে দেখলেন- 'এতকাল চলার পরে বকশিস পেলুম আমি তিন রঙের তিন ফোঁটা মধু'।

ঠুক্-ঠাক্ গড়েন কুটুম-কাটাম :

এক-সময় শিল্পীর হঠাৎ আর মাথার কাজ করতে ইচ্ছা হল না। তার চেয়ে বরং মনের কাজ আর হাতের কাজ অনেক শ্রেয় মনে হল। একটা হাতের কাজ খুঁজে বারও করলেন যেখানে মাথাকে তেমন কষ্ট দিতে হল না-

> *"পুতুল গড়তেও আমার কষ্ট হয় না। যেখানে হাত চোখ আর মন কাজ করে। অন্য আর কিছু ভাবতেও ইচ্ছা করে না।"* [৯]

তাঁর এই খামখেয়ালী দেখে রবিকা বলতেন 'অবন একটা পাগলা'। অবন ঠাকুর নিজেও অবশ্য তা অস্বীকার করেননি— 'একদিন হয়তো পাগলই হয়ে যেতুম, কেবল পুতুল আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই নিয়েই কোনোরকমে ভুলে থাকি'। এই ভুলে থাকা ও ভুলিয়া রাখার আরো একটা পদ্ধতি ছিল, তা হল 'হীরে খোঁজা'। বিভিন্ন পাথর খুঁজে সংগ্রহ করে তাকে ধুয়ে প্রয়োজনে ভেঙে দেখতেন হীরা আছে কিনা। তাই খুট-খুট ঠুক্-ঠাক্ তাঁর চলতই। এও এক নতুন খেলা নতুন ঝোঁক। আর সেই ঝোঁকেই এল 'কুটুম-কাটাম'। তবে মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'দক্ষিণের বারন্দা'-এ বলেছেন-

> *"অনেকের ধারণা দাদামশায় শেষ বয়সে টুকরো টাকরা নুড়ি-পাথর, কাঠি-কুটি, ডাল-পালা সাজিয়ে কুটুম কাটাম বানাতে শুরু করেছিলেন। শুরু কিন্তু তিনি শেষ বয়সে করেন নি, করে ছিলেন বহু আগে। এই যে পাথরগুলি কাটতেন সাজাতেন এ সবই কুটুম-কাটাম।"* [১০]

আসলে দিন-ক্ষণ দেখে কোনো সত্তার জাগরন ঘটে না। কখন কীভাবে মনের মধ্যে সে অল্পে-অল্পে জেগে ওঠে তা আমরা খেয়াল করি না। চমক লাগে তার পূর্ণ জাগরণে। কিন্তু তবুও আমরা তার সামগ্রিক সত্তাকে খণ্ড খণ্ড করে বিচার করতে চাই। বোধ হয় শিল্পীও তাঁর সৃষ্টির একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। তাই নতুনতর দিকে যাত্রার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল।

যাত্রাপালা-পুঁথির মেলা :

রবিকা-কে বলেছিলেন ছবি আঁকায় 'ডিফিকালটি ওভারকাম' করার যে আনন্দ তা তিনি আর পান না, তাই ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছেন। আবার জসীমউদ্দীনকে বলেছিলেন, 'ছবি আঁকা আসছে না কী করে সময় কাটাই'। আসলে নতুন কিছু করার তাগিদ অনুভব করেছিলেন। রাণী চন্দের কাছে রেখেছিলেন আন্য বক্তব্য- 'আমি তো বলি আমি পরিপূর্ণতা পাইনি তার আগেই বয়সের পরিপূর্ণতা এসে গেছে। তাই ক্ষমতা নেই, বসে বসে খেলনা গড়ি।' একদিকে মাথাকে বিশ্রাম দেওয়ার বাসনায় 'কুটুম-কাটাম' করে চলা, অন্যদিকে গগনেন্দ্রনাথ ও নিজের স্ত্রী-র অসুস্থতা তাঁকে বেদনাহত ও হতাশ করেছিল। একই সঙ্গে সৃষ্টিকর্মে অপূর্ণতা তাঁকে ভেতরে ভেতরে অসহিষ্ণু করে তুলেছিল- 'এত করলুম, কী লাভ হলো তাতে?'

এই লাভের অঙ্ক মেলাতে গিয়েই একদিন চোখে পড়ল বাড়ির ছেলেরা তাঁরই লেখা একখানা পুরোনো নাটক মঞ্চস্থ করার চেষ্টা করছে, নাম 'এস্‌পার-ওস্‌পার'। মনে পড়ে যায় তাঁর লেখা সেই শিবসদাগর, রাসধারী, রঙবেরঙ, নোয়ার কিস্তি- সব নাটিকার কথা। ছেলেদের উৎসাহে নাটকটিকে নতুন রূপ দিলেন, হল 'এস্‌পার ওস্‌পার' পালা। তাঁর বক্তব্য- 'নাটুকে ভাবটা উড়িয়ে দিলুম। খাঁটি যাত্রার ছাঁদে ঢেলে দিয়েছি এবার'। ঠাকুর বাড়িতে লাগল নতুন ধারার হাওয়া। এই নতুন ধারায় বইবেন বলেই বোধহয় তিনি নতুন নতুন কারণ দেখাচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য ছবি আঁকায় বিরতি; সময়টা ১৯৩০ খ্রি: মোহনলাল বলেছিলেন-

> *"এস্‌পার ওস্‌পার' পালা সাঙ্গ হল। এ এক অভিনব পালা। দাদামশায় বললেন, নাট্যাভিনয়ের সারবস্তু আবিষ্কার করে ফেলেছি আমরা। এ ছাড়া নয়। দেখা যাক এই পথে চলে আর কিছু পাওয়া যায় কিনা'। এই বলে দাদামশায় যাত্রা লেখায় মন দিলেন। ছবি আঁকা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। এ সময় বোধ হয় আট-দশ বছর ছবি আঁকেন নি। তুলি কাগজ ছোঁন নি একবারও।"* [১১]

বেন্‌থল সাহেবের ছেলেকে তাঁর ছবি আঁকা ছেড়ে দেওয়ার কারণ হিসেবে বলেছিলেন-

> *'দেখলুম ছবি-টবি কিছু নয়। ছেলেমানুষি। গভীরতর রসের সন্ধানে নেমেছি। নানা রকম শব্দ বাজিয়ে বাজিয়ে দেখছি কি রকম চিত্র ফুটে ওঠে মনের মধ্যে।'* [১২]

এক সময় উৎসাহিত হয়ে ওঠেন বেন্‌থল সাহেবের ছেলেকে যাত্রা শোনানোর ইচ্ছায়। কিন্তু তাতে বাধা পড়ে। তারপর আর জোড়াসাঁকোয় যাত্রা অভিনীত হয় নি। কিন্তু তাঁর যাত্রা লেখা থামেনি। লিখলেন 'উড়নচন্ডী পালা', 'মউর ছালের পালা', 'গজকচ্ছপের পালা', 'ভূতপত্রীর যাত্রা', 'লম্বকর্ণ পালা', 'ঋষি যাত্রা' আরও কত।

এরপর শুরু হল রামায়ণের গল্পগুলিকে নিয়ে একটার পর একটা যাত্রা লেখা। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে লেখা যাত্রা ঠিক যেন নিজেরই পছন্দ হচ্ছিল না, মন খুঁত-খুঁত করছিল। কারণ খুঁজতে খুঁজতে দেখলেন সমস্যা হল 'পয়ার'-এ। এবার শুরু হল পুঁথি লেখার পালা। জসীমুদ্দীনের কাছ থেকে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করতে লাগলেন। কবিগান, জারিগান সেই সঙ্গে মেছোবাজার, নতুনবাজার থেকে পুঁথি সংগ্রহ করে এনে উচ্চসামাজিক মানসিকতা ছাড়িয়ে অতি তুচ্ছকে আকুলভাবে গ্রহণ করলেন প্রকাশ করলেন তাঁর চাঁইবুরোর পুঁথি, হনুমানের পুঁথি, মারুতি পুঁথি, জয়রামের পুঁথি-তে। এবার এই পুঁথিগুলিকে সামনে রেখে মনের মতো রামায়ণ যাত্রা লিখলেন। 'আজকাল এক এক সময়ে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই তুচ্ছ জিনিসেও কত সব দেখতে পাই। এ চোখ আমার আগে কোথায় ছিল?' এ চোখ সে চোখ নয়, এ চোখ সামগ্রিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় চক্‌চক্ করছে। রবীন্দ্রবলয় অতিক্রান্ত অন্য আনন্দময় মুক্তির পথ অনুসন্ধানের চেষ্টায় নাট্যধারার মুক্তি ঘটালেন যাত্রাপালায়, মঞ্চমুক্তিও ঘটালেন, তা মোহনলালের স্মৃতিচারণায় স্পষ্ট। দাদামশায় বলেছিলেন- 'যারা যাত্রা দেখতে আসবে তাদের দলে টেনে নে, তবে তো জমবে যাত্রা।'

অভিনব যাত্রা, খুদ্দুর না অবন ঠাকুরের?

বাষটি থেকে বাহাত্তর ছবি আঁকায় বিরাম দিয়ে যে খামখেয়ালীকে একমাত্র পাথেয় করে চলেছিলেন খোশমেজাজে সেই যাত্রারই এক অভূতপূর্ব নিদের্শন 'খুদিরাম লীলা' বা 'খুদ্দুর যাত্রা'। কিন্ত্র এ একেবারে অন্য রূপ-রস-ভাবনা নিয়ে দেখা দিল। অতি সাধারণকে দিলেন বিশেষ রূপ, যে রূপ বাস্তবের হাড়হদ্দের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে সৃষ্টি করল এক উদ্ভট রসের উৎসার। পাতায় পাতায় শুধু লেখা নয় তার সঙ্গে সেটে দিয়েছেন কাগজ থেকে কাটা বিজ্ঞাপন, বিভিন্ন ছবি, সিগেরেটের প্যাকেট, দেশলাইয়ের বাক্সের মেয়ের মুখ, চকলেটের মোড়ক, কাপড়ের টুকরো, গয়নার ডিজাইন। সিনেমার হ্যান্ডবিল, পঞ্জিকার পাতা। এ খাতাই বোধ হয় জসীমুদ্দীন দেখেছিলেন, 'ঠাকুরবাড়ির আঙিনা'-তে তা উল্লেখ করেছিলেন- 'অবনীন্দ্রনাথ অনেকগুলি খবরের কাগজ লইয়া কাঁচি দিয়ে অতি সাবধানে ছবিগুলি কাটিয়া লইতেছেন। কতরকমের বিজ্ঞাপনের ছবি- সেগুলি কাটিয়া কাটিয়া যাত্রার পাণ্ডুলিপির এখানে ওখানে আঠা দিয়া আটকাইয়া লইতেছেন।' একেবারে সূচনাতেই রবীন্দ্রধারায় শব্দের কাটাকাটিতে গনেশমূর্তি গড়ে তুললেও এরপর আর কাটাকুটি খেলা নয়, এবার কেটে কেটে সেটে দেওয়া খেলা। রাম চলেছেন বনে 'হেলিছে দুলিছে যেন অযোধ্যার আকাশ' পাশেই আটা হল কাগজকাটা ছবি। তাতে দেখা যাচ্ছে, আগুন জ্বলছে, ধ্বংসস্তূপ আর বড় বড় করে লেখা DANTE'S INFERNO, SOULS IN HELL. 'রামসীতাকে কটক উত্তরিল'- বলতে পাশে দিলেন জগন্নাথের রথের ছবি। রামের খড়ম নিয়ে ভরত ফিরছে পাশে লটকে দিলেন সার দেওয়া জুতো আর পাশে বিজ্ঞাপন Radu & Co. 75/A College St. 'সুর্পণখার নাশাকর্ত্তন' পাশে রাখলেন ক্রিমের কৌট হাতে আয়নার সামনে এক ভাবনারত বিকট মূর্তি, ওপরে লেখা- 'চুরি করেও মাখতে ইচ্ছে যায়'। সুর্পণখার সাজগোজের কথায় উঠে এল 'সাবান বুলমফরোজ', তাতে ছবি লাগানো হল তোয়ালে হাতে এক নারীমূর্তি, পাশে লেখা 'সাবান ও গরম জলেও লোমকূপের ভিতর ময়লা পরিষ্কার হয় না, তোয়ালে দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখুন'। 'সীতা হরণ' ছবি লাগালেন হিন্দি ছবি 'হিন্দ কেসরী'-র বিজ্ঞাপন যেখানে ঘোড়-সওয়ার এক

বাহাদুরের ছবি রয়েছে। লঙ্কাকাণ্ডের শুরুতে সাটিয়ে দিলেন পঞ্জিকার পাতা থেকে কেটে নেওয়া 'লঙ্কা' ও 'অতিবৃহৎ লাল মূলা'। কবন্ধের বর্ণনায় কোলাজের কাজ। এভাবেই বাংলা ছবির জগতে কোলাজের আবির্ভাব ঘটালেন। এখানেও সেই মুক্তি, মনের ও শিল্পের। রবীন্দ্রনাথই তাঁর সঠিক মুল্যায়ন করেছিলেন, তাই লিখেছিলেন অবনীন্দ্রনাথকে- 'এরকম বিশুদ্ধ পাগলামির কারুশিল্প আর কারো কলম থেকে বেরোবার জো নেই'। আসলে সত্যিই তো, এটা পাগলামো নয় বরং খুব সচেতন কারুশিল্প। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষনীয়- নতুনের আকাঙ্ক্ষায় অবন ঠাকুর তখন আকুল। অনবরত বদলাচ্ছেন দৃষ্টিভঙ্গী। কখনও ছবিতে ফর্ম বদলাচ্ছেন, কখনও রূপের জন্য রূপকে বদলাচ্ছেন। কখনও বা পালায় ঘনিয়ে তুলছেন এলোমেলো শব্দকল্প। তাঁর স্বীকারোক্তি 'কল্পনার হিস্টিরিয়া হয়েছে'। তবে কল্পনা নয়, অতি সাধারণ বাস্তবকে গ্রহণ করেছেন আগ্রহভরে। খণ্ডের পরিবর্তে সমগ্রকে গ্রহণ, এই সূত্রেই ঘটেছে চেতনার প্রসারণ। যেখানে ধরা দেয় বাণিজ্য-নির্ভর এক আপাত আধুনিক আরষ্ঠ সমাজ। সেই কঠোর সমাজকে সহজেই মেনে নিচ্ছেন। কারণ বিশ্বজগতের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার বাসনায় তখন তিনি আত্ম-আবিষ্কারে নেমেছেন। সেই কারণেই প্রতিনিয়ত নিজের বলয় নিজেই অতিক্রম করে প্রসারণ ঘটাচ্ছিলেন আপন সত্তার। তাই প্রথাসিদ্ধ সুন্দর বলে নির্দিষ্ট নির্বাচনকেই শুধু গ্রহণ করলেন না। বরং এই পৃথিবীতে যা যেমনভাবে আছে তাকে ঠিক সেইভাবেই স্বীকার করলেন। সুন্দরকে নিয়েই শিল্পীর কারবার। কিন্তু অসুন্দরকেও যে সুন্দর করে তোলা যায় তার প্রমাণ রাখলেন তিনি। শিল্পী তথা পালাকারের মনে ভাঙাগড়ার খেলা চলছিল। সেই সঙ্গে সমাজের ভাঙাগড়াকে আধুনিক মননে গ্রহণ করে, আত্মীকৃত করে তাকে প্রকাশ করলেন। গতানুগতিক ধারায় বিভিন্ন স্রষ্টার মতো তিনি 'পুরাণ'-কে নতুন ব্যাখ্যা দ্বারা বিশ্লেষণ করলেন নি। বরং পুরাণ-কে সমসাময়িক বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টাকেই প্রাধান্য দিলেন। যেমন সুর্পণখার নাশাকর্তনে তার প্রসাধনের বর্ণনা করেছেন। যেখানে নারীর চিরন্তন প্রেমিকা সত্তাকেই তিনি তুলে ধরেলেন, বাস্তবের সাথে মিলিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠা দিলেন। এ যেন চিরন্তনতাকেই আবিষ্কার করা। এরকমই আত্ম-আবিষ্কারের নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। তাঁর ফর্মের পালাবদল যেন নিজের 'হয়ে ওঠার' অসহিষ্ণুতারই প্রকাশ। চিত্রশিল্পী হয়েই থেকে যেতেন হয়তো, হয়তো তিনি তাঁর 'আমি'-তেই গণ্ডীবদ্ধ হয়ে যেতেন কিন্তু বারবার সেই 'আমি'-র প্রকরণ পরিবর্তন- যেন প্রতিবারই গুটি কেটে বেড়িয়ে পরা প্রজাপতি, যার রঙের বাহার রূপের ছটা বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর যদি তা না হত তবে 'আমি' ফুরিয়ে যেত। তাই 'আমি' থেকে 'আমি'-র উত্তরণে তথা অনন্ত 'আমি'-র খোঁজে অবন ঠাকুরের এই যাত্রা। এ যাত্রা যেন খুদ্দুর নয় অবন ঠাকুরের নিজের অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে যাত্রা।

পাঠককুলের যাত্রা :

প্রশ্ন জাগে এ যাত্রা শুধুই কি অবন ঠাকুরের যাত্রা? নাকি সমগ্র পাঠককুল তারই হাত ধরে এক নতুন পথে যাত্রা করলেন, যে অনাস্বাদিত মুক্তির আস্বাদ তিনি দিলেন সেই মুক্তি কি সাহিত্য জগতের নতুন পথের নিশানা দেয় না? কল্পনার সঙ্গে বাস্তবকে, বাস্তবের মতো করেই গ্রহণ করার সাহস এবং সেই সাহসেই খণ্ড অতিক্রান্ত সমগ্রতাকে দু-হাত বাড়িয়ে আন্তরিকভাবে গ্রহন করবার উৎসাহ এ তো তাঁরই দান। এই খুদ্দুর যাত্রা শেষ পর্যন্ত অবন ঠাকুরের হাত ধরে 'খুদিরাম লীলাকে' পাথেয় করে আসলে তা এক অভিনব উত্তরণের সন্ধানে পাঠককুলের যাত্রা।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১২৪
২. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, শ্রীরানী চন্দ, জোড়াসাঁকোর ধারে, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, চৈত্র ১৪১২ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১০৫
৩. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-

৭৪

৪. গঙ্গোপাধ্যায়, মোহনলাল, দক্ষিণের বারান্দা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, পুনর্মুদ্রণ ১৪১৪, পৃষ্ঠা-৩৪

৫. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, শ্রীরানী চন্দ, জোড়াসাঁকোর ধারে, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, চৈত্র ১৪১২ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৬৮

৬. তদেব, পৃষ্ঠা-১৫৯

৭. তদেব, পৃষ্ঠা-১৬০

৮. তদেব, পৃষ্ঠা-১৬৩

৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৯৯

১০. গঙ্গোপাধ্যায়, মোহনলাল, দক্ষিণের বারান্দা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, পুনর্মুদ্রণ ১৪১৪, পৃষ্ঠা-১৬

১১. গঙ্গোপাধ্যায়, মোহনলাল, দক্ষিণের বারান্দা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, পুনর্মুদ্রণ ১৪১৪, পৃষ্ঠা-৩৪

১২. তদেব, পৃষ্ঠা-১৪৪